ক্যাম্পাসের স্মৃতিময় দিনগুলো

২০২৫ সাল চলছে। প্রিয় ক্যাম্পাস ছেড়েছি ১৭ বছর চলছে। এই ১৭ বছরে জীবনটা ব্যস্ত থেকে ব্যস্তময় হয়ে চলেছে। চাকরি, সংসার, ছেলেদের সামলানো সবকিছু মিলিয়ে মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকানোর সময় হয়না। আমার অতি প্রিয় নয়নাভিরাম, সবুজ শ্যামল ক্যাম্পাসে হাতে গোনা কয়েকবার গিয়েছি এই ১৭ বছরে । এখন জীবন যেমন, সবুজের দেখা পাই না, শান্ত, স্নিগ্ধ নির্মল পরিবেশ পাই না, অতি ব্যস্ত শহরে জীবন চলছে। অথচ এই অতিরিক্ত ব্যস্ততম শহরে থাকবো ভাবিনি।

২০০১-২ সেশনে ২০০২ হতে ২০০৮ সাল জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত কাটিয়েছি।আমরা ৪ রুমমেট মনি, রেহানা, নিপা, আমি ১১৫ নম্বর রুমেই কাটিয়ে দিয়েছি। শুধুমাত্র মনি দুই তিন বছর পর ১১৫ নম্বর রুম পরিবর্তন করে অন্য রুমে গিয়েছিল কিন্তু আমাদের ১১৫ তে ছোট্ট মনি এসেছিল। কিন্তু বড় মনির সাথে আমাদের সম্পর্কটা আগের মতই আছে । চার বোনের মতই আমরা ছিলাম ১১৫ তে। ১১৫ নম্বর রুমে সবার জন্মদিনের সবাই সবাইকে মনে করতাম, কেক আনতাম। পরিবার পরিবার পরিজন ছেড়ে সবাই যেন আমরা এক আত্মা। এখনো আমরা অনেকক্ষণ কথা বলি ভিডিও মেসেঞ্জারে সবার জন্মদিনে। সবাই আমরা মা হয়েছি। হলের মধ্যে পলিন এবং তাপসীর সাথে সম্পর্কটা আরো আগের। আমি এবং পলিন ও তাপসী আমরা আগে এনিমেল হাজবেন্ডটিতে ভর্তি হয়েছিলাম। পরে আমি ফিসারিজে চলে এসেছি। পলিনের রুমে মাঝে মাঝে যেতাম, সেও মাঝে মাঝে আমাদের রুমে আসত, রাতের বেলা ঘুমিয়ে যেত এবং সকালে চলে যেত।

ক্যাম্পাসে ফিশারিজ ফ্যাকাল্টির আমরা সবাই ক্যাম্পাস পদচারণায় ওস্তাদ ছিলাম। আমি বিশেষ করে টিনা, ইফতি, সুইট, হাবিবা এদের সাথে সন্ধ্যেবেলা হাঁটতাম, বিশেষ করে শীতের সন্ধ্যে বেলায় হেঁটে পরে কোথাও দাঁড়িয়ে অথবা বসে ভাপা পিঠা খাওয়া, কোনদিন রেললাইন ধরে হাটা, ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে হাটা সবই চলতো। ব্রহ্মপুত্র নদে মাঝে মাঝে নৌকা করে নদীর ওপারে চা খাওয়া, ফিস কমপ্লেক্স এ দলবেঁধে হেঁটে যাওয়া , হাটাকে খুব এনজয় করতাম আমরা। এ ব্যাপারে আমাদের টিনা ও ইফতির ঝোঁক ছিল, আমিও পছন্দ করতাম।

কি যে ছেলেমানুষি করতাম মাঝে মাঝে ভাবতেই হাসি পায়। একবার কি কারনে জানি মন খুব খারাপ হয়েছিল। পরীক্ষার আগের রাতে পড়াশোনা না করে মাইক্রোবায়োলজি পরীক্ষায় carry নিয়েছিলাম এবং বায়োকেমিস্ট্রি পড়াশোনা করিনি বলে carry নিয়েছিলাম।

মনে পড়ে কোন এক সেমিস্টার ফাইনাল শেষে বৃষ্টির দিনে টিনা, হাবিবা, সুইট , আমি মিলে টি এস সি তে এসেছি। টিএসসির পেছনে একটা শাপলা ফুলের চত্বর ছিল, এর চারপাশে পানি ছিল। আমি টিএসসির পেছনদিকে যেয়ে শাপলা ফুলের চত্বরে মাঝখানে আমার ব্যাগ সহ জুতা সহ হাঁটা শুরু করেছি যেই, অমনি ধপাশ করে পড়ে গিয়েছিলাম। কিছু বুঝতে না বুঝতেই হাবুডুবু খেয়ে অন্য প্রান্তে উঠে পড়েছি। সে কি অবস্থা! তারা তো হাসতে হাসতেই শেষ। টিনা ও হাবিবা আমাকে পেছন দিক থেকে একটা রিক্সা দেখে দ্রুত ভেজা কাপড়ে হলে পাঠিয়ে দেয়। আমার সেই স্মৃতি মনে পড়লে এখনো হাসি পায়।

প্রিয় ক্যাম্পাসে আমার স্মৃতির শেষ নেই। আরেকদিনের কথা মনে পড়ে আমি, রেহানা, অ্যাপোলো, সুজন, মামুন, বাতেন, আরিফ প্র্যাকটিক্যাল শেষ করে নৌকায় উঠেছি। ব্রহ্মপুত্রের পানিতে সেদিন ঢেউ একটু বেশিই ছিল। এমন দুলনি দিচ্ছিল আমরা তো ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলাম।আমি তো সাতার জানিনা। আমি দোয়া ইউনুস পড়ছিলাম। মামুন বাইরে দাঁত কেলিয়ে হাসছিলো কিন্তু ভেতরে ঠিকই ভয় পেয়েছিল।যাইহোক নৌকো তীরে ভিড়লো, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার প্রত্যেকটি সাবজেক্টের ছুটির আগে আমি, লিসা এবং টুম্পা (ব্যাংকার) তিনজন মিলে পড়াশোনার ঝাপি খুলে বসতাম। ডিসকাশন চলতো। সেটা শুরু হতো রাতের খাওয়ার পর হতে মধ্যরাত অবধি। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আমরা তিনজন পড়ার ডিসকাশন চলতে চলতে কোন রাজ্যে যে হারিয়ে যেতাম গল্পের ঝুড়ি নিয়ে বুঝতেই পারতাম না। যখন প্রায় ঘন্টা পার হতো তখন নিজেরাই হাসতাম। উপভোগ্য বিষয় হলো আমাদের মধ্যকার আলোচনা কোন বৈষয়িক আলোচনা ছিল না, মধ্যরাতের গল্প বলে কথা।

রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধনের সদস্য ছিলাম আমি। মনে পড়ে একবার হলের কোন একজন ডোনার কে আমি ও আর একজন সদস্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডোনার কে শোয়ানো হয়েছে। ব্লাডের ব্যাগে রক্ত টানা হচ্ছে। আমি ডোনারের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার মাথাটা কেমন করে যেন উঠলো, পরে আমার আর কিছু মনে নাই। একটু পরে আমাকে আমি শোয়ানো দেখলাম। আমি নিজেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমরা পহেলা বৈশাখ টি বিশেষভাবে কাটাতাম। বিশেষ করে ফিশারিজের বন্ধুরা। পহেলা বৈশাখের সকালে সবাই সেজেগুজে বৈশাখী চত্বরে সময় কাটিয়ে ব্রহ্মপুত্রের নদীর পাড়ে চলে আসতাম। একটা বড় নৌকা ভাড়া করে জয়নুল আবেদীন পার্ক পর্যন্ত যেতাম। খুবই উপভোগ্য সময় ছিল সেটা।নৌকার মধ্যে ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে নদীর প্রান্তরের প্রকৃতি দেখতাম। জয়নুল পার্কে নৌকা ভিড়িয়ে সেখানেও সময় কাটিয়ে শহরে লাঞ্চ করে রিক্সা করে চলে আসতাম ক্যাম্পাসে। প্রতিটি বৈশাখে প্রায় একই রকম রুটিন ছিল আমাদের।

ক্যাম্পাসে ফিশারিজ ফ্যাকাল্টির প্রিয় স্যারদের কথা খুব মনে পড়ছে । সবচেয়ে সিনিয়র স্যার আমিনুল ইসলাম স্যার (প্রয়াত), ফাহমিদা ম্যাডাম (প্রয়াত), মোখলেসুর রহমান খান স্যার (প্রয়াত) ,মিলটন স্যার, আলী রেজা ফারুক স্যার, শামসুল আলম স্যার, ওহাব স্যার এবং আমার প্রিয় মোস্তফা আলী রেজা হোসেন অরফে রানু স্যারের (প্রয়াত) কথা খুব মনে পড়ছে। পরপারে চলে যাওয়া স্যারদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। রানু স্যার আমার অতি প্রিয় স্যার গত ৩০ শে জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একদমই হঠাৎ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। মহান আল্লাহ পাক স্যারকে বেহেস্ত নসিব করুন।

রানু স্যার এর চলে যাওয়াটা আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বিশ্বমানের গবেষক ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি আমার MS সুপারভাইজার ছিলেন। Fish Museum and Biodiversity Centre এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। দেশের বিলুপ্তি প্রায় মাছ যেগুলো Red List এ নাম এসেছে সেগুলো নিয়ে তিনি কাজ করতেন। মাছ গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এসব নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন। মাস্টার্স করার সময় স্যার এর আন্ডারে আমরা ছয় জন ms স্টুডেন্ট ছিলাম। স্যারের একটা প্রজেক্ট ছিল। আমার মনে আছে প্রজেক্ট থেকে সবাইকে ভাতা দেওয়া হতো। আমি মাসে ১৫০০/টাকা করে পেতাম। সেই ১৫০০/ টাকা আমি জমিয়ে রাখতাম। এভাবে ১৩/১৪ মাস ১৫০০/ করে জমিয়ে আরো কিছু টাকা জমিয়ে আমি থিসিস সেমিস্টারে একটা কম্পিউটার কিনেছিলাম। আমি রানু স্যার কে বলেছিলাম “স্যার আপনার দেয়া টাকাটা জমিয়ে আমি কম্পিউটার কিনেছি “। স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন।

আমি খুব ভাগ্যবতী এজন্য যে ক্যাম্পাস ছাড়ার আগেই আমার চাকরি হয়ে যায়। মহান রবের কাছে আমি চাইতাম “হে প্রভু, এই ক্যাম্পাস থেকে যেন আমি খালি হাতে না যাই ।’মহান রব আমার কথা শুনেছিলেন। মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
মাস্টার্সে পড়তেই সোনালী ব্যাংকের রিটেন এবং ভাইবা দেই। এর মাঝে মৎস্য অধিদপ্তরের এনএটিপি প্রজেক্টে চাকরি হয়। MS complete শেষে ক্যাম্পাস ছাড়ার সময় এনএটিপির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে দিনাজপুরে যোগদান করি। রানু স্যার আমাকে সতর্ক করেছিলেন “তোমাকে এটা নিয়ে থাকলে হবে না, এটা কিন্তু প্রকল্প “। প্রকল্পে ১৫ দিন চাকরি করার পর সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে আপয়েন্টমেন্ট লেটার পাই। রানু স্যারের সাথে দেখা করতে গেলে রানু স্যার খুব খুশি হয়েছিল। সালাম স্যারকে দেখিয়ে রসিকতা করে বলেছিলেন “কোটি টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি “।

আমার বাবাও খুব খুশি হয়েছিলেন। ২০০৮ সালে আমার বাবা মা রিটায়ার্ড করেছিল। ২০০৮ সালে আমি প্রথম চাকরিতে যোগদান করেছি। মহান আল্লাহ পাকের কৃপায় আমাকে একটা দিনও বেকার থাকতে হয় নাই এটা ভাবতে ভালো লাগে। শুধুমাত্র স্যারের জন্য খুব কষ্ট হয়। স্যার কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন? আমার বাবা ও ২০১৫ সালে চলে গেলেন।বাবাকে বেশি দিন পেলাম না।
আজ এই নিঃশব্দ বিকেলে অনেক কিছুই মনে পড়ে। কত সময় চলে গেল। জীবনের মধ্যগগনের সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিমের দিকে যেতে শুরু করেছে। কেউ থাকবো না আমরা। আমাদের হীরা চলে গিয়েছে। কার কখন ডাক পরে জানিনা। সবাই সবার জন্য দোয়া করি, সুস্থতা কামনা করি। সবাই যেন ঈমান এবং আমলের সাথে যেতে পারি অজানা গন্তব্যে।

মারজিয়া সুলতানা
ফিশারিজ ফ্যাকাল্টি, ২০০১-০২ সেশন,
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৯১২৫
এবং
সহকারি পরিচালক
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি,
মৎস্য অধিদপ্তর ঢাকা।
৩০/১১/২০২৫, বিকাল ০৪টা।